ভেড়ার কন্টাজিয়াস একথাইমার চিকিৎসা ও প্রতিকার

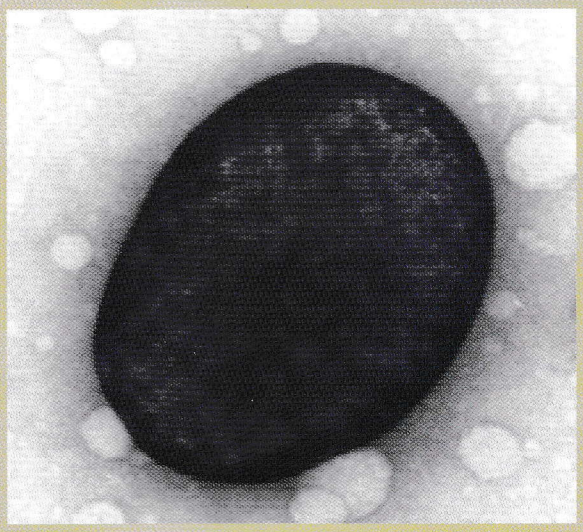

সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

সাভার, ঢাকা-১৩৪১

কন্টাজিয়াস একথাইমা একটি অত্যন্ত সংক্রামক, জুনোটিক, ভাইরাস জনিত চামড়ার রোগ যা প্রধানত ছাগল ও ভেড়ায় হয়ে থাকে। এরোগটি অরফ, কন্টাজিয়াস পাসচুলার ডার্মাটাইটিস, সোর মাউথ বা স্ক্যাবি মাউথ নামেও পরিচিত। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই এ রোগ দেখা যায়।

গুরুত্ব ঃ

❖ এরোগ হলে চামড়ায়, মুখে ও নাকে ব্যথাদায়ক ক্ষত তৈরি হয় ফলে ভেড়ায় অরুচি ও ক্ষুধামন্দা দেখা দেয় এবং ভেড়া ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে, উৎপাদন কমে যায়।

❖ ওলানে ক্ষত হলে ভেড়ী বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে চায় না এবং বাচ্চাকে ছেড়ে দেয়। ফলে, বাচ্চার পুষ্টির অভাব হয় এবং দুর্বলতায় ভোগে। সাধারণত বাচ্চায় এ রোগটি বেশী দেখা যায়। বাচ্চা খেতে পারে না এবং খাওয়ায় অরুচি হয়। পরবর্তীতে বাচ্চা মারা যেতে পারে।

❖ পায়ে লক্ষণ দেখা দিলে ভেড়া ক্ষণস্থায়ীভাবে খোড়াঁতে থাকে।

❖ দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমন হলে ভেড়ার আভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রতঙ্গ আক্রান্ত হতে পারে।

❖ এ রোগের জুনুটিক গুরুত্ব রয়েছে অর্থাৎ ভেড়া থেকে মানুষের মাঝে এরোগ ছড়াতে পারে।

রোগের কারণ ঃ

পক্সভিরিডি পরিবারের অন্তর্গত প্যারাপক্স জেনাসের অধীন কন্টাজিয়াস একথাইমা ভাইরাসের কারণে এরোগ হয়ে থাকে।

রোগের সংক্রমন ঃ

প্রতক্ষ্য সংস্পর্শের মাধ্যমে ভেড়া থেকে ভেড়ায় কিংবা অন্য কোন পশুতে ছড়াতে পারে। পরোক্ষ সংস্পর্শের (যেমন- খামারে ব্যবহৃত সংক্রমিত খাদ্যদ্রব্য, তৈজসপত্র কিংবা যানবাহন এবং খামারে নিয়োজিত কর্মী বা ডাক্তার) মাধ্যমেও এ রোগ ছড়াতে পারে।

রোগের লক্ষণ ঃ

❖ রোগের সুপ্তিকাল ২-৩ দিন। প্রথমে দুই ঠোঁটের সংযোগস্থলের কোনায় লাল হয় এবং ৩/৪ দিনের মধ্যে ছোট ছোট গুটির মত প্যাপুল দেখা যায়। প্যাপুল থেকে পাসচুল হয়। এসময় দেহের তাপমাত্রা বিশেষ করে বাচ্চার ক্ষেত্রে ১০৪° - ১০৬° ফাঃ পর্যন্ত হয়ে থাকে এবং আক্রান্ত স্থান অত্যন্ত বেদনাদায়ক হয়। পাসচুল ফেটে গিয়ে এর ভিতরের পুঁজ ও আক্রান্ত টিস্যু শুকিয়ে বড় বড় গুটির মত স্ক্যাব সৃষ্টি করে। ধীরে ধীরে ক্ষত বা ঘাঁ বৃদ্ধি পেতে থাকে যা উভয় ঠোঁট জুড়ে ও ঠোঁটের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং ঠোঁট মোটা হয়ে যায়। ঘাঁ ক্রমশ দাতেঁর মাড়ি ও নাকে বিস্তার লাভ করে এমনকি মুখ-গহবরেও বিস্তৃত হতে পারে।

❖ বাচ্চা দুধ পান করতে পারে না, ফলে ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে মারা যেতে পারে। আক্রান্ত বয়স্ক ভেড়ায় অরুচি ও ক্ষুধামন্দা দেখা দেয় এবং ভেড়া ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে, ফলশ্রুতিতে উৎপাদন কমে যায়।

চিত্র ঃ ভেড়ার কন্টাজিয়াস একথাইমা

❖ দুই ক্ষুরের মাঝখানে, ওলানে, কানে, মলদ্বারে ও ভালভার চারপাশে ক্ষত বা ঘাঁ দেখা দিতে পারে। পায়ে ক্ষত হলে ভেড়া দাড়াঁতে চায়না এবং খোড়ায়। ওলানে হলে ম্যাস্টাইটিস হতে পারে।

❖ দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যাকটেরিয়ার বা স্ক্রু ওয়ামের লার্ভার সংক্রমন হলে মারাত্মক আকার ধারন করে।

❖ ম্যালিগনেন্ট রুপে হলে মুখের ভিতরে ফুলকপির মত টিউমার দেখা যায় এবং এ অবস্থায় ফ্যারিংস, ইসোফেগাস এবং রুমেনের গোড়া পর্যন্ত বিস্তার লাভ করতে পারে।

পোস্ট মর্টেম লক্ষণ ঃ

❖ ঠোঁটের কোনে, মাথায়, ওলানে ও পায়ে পাসচুলার ও স্ক্যাবি ক্ষত পাওয়া যায়।

❖ নাসাপথে আলসারেটিভ চিহ্ন এবং ইসোফেগাস ও আপার রেসপাইরেটরি ট্র্যাক্টে ক্ষত পাওয়া যায়।

❖ রেটিকুলাম, ওমেসাম এবং অন্ত্রে প্রদাহ দেখা যায়।

❖ ফুসফুস, প্লুরা ও যকৃতে নেক্রোটিক চিহ্ন দেখা যায়।

চিকিৎসা ঃ

❖ প্রথমেই অসুস্থ ভেড়াকে আলাদা করতে হবে।

❖ ভাইরাস জনিত রোগ বিধায় এর নির্দিষ্ট কোন চিকিৎসা নেই। তবে দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমন রোধ করার জন্য এন্টিবায়োটিক ওয়েন্টমেন্ট বা পাউডার অথবা ভ্যাসেলিন ও আয়োডিন একসাথে মিশিয়ে দিনে ২-৩ বার প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম দিকে দীর্ঘ কার্যকর এন্টিবায়োটিক ইনজেকশন দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

❖ স্ক্রু ওয়ামের লার্ভার সংক্রমন হলে তার্পিন তেল বা অন্য কোন মাছি নিবারক ঘাঁ এর চারদিকে প্রয়োগ করতে হবে।

❖ আক্রান্ত বাচ্চাকে নরম ও তরল খাবার খাওয়াতে হবে।

প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রন ঃ

১) ভ্যাকসিন বা টিকা প্রয়োগ করে এ রোগ প্রতিরোধ সম্ভব।

❖ অনাক্রান্ত ভেড়ার পালে তিন মাসের অধিক বয়সী ভেড়ার জন্য একবার টিকা দিতে হয়।

❖ তিন মাসের কম বয়সী ভেড়ার জন্য দুইবার টিকা প্রয়োগ করতে হবে ৪-৬ সপ্তাহ পর পর। ৬-১২ মাস পর পুনরায় টিকা প্রয়োগ করতে হবে।

❖ বাচ্চাদের ১-২ দিন বয়সে ১ম ডোজ, ১০-১৪ দিন পর ২য় ডোজ এবং ৩ মাস পর ৩য় ডোজ দিতে হবে।

২) খামারের জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। যেমন-

❖ পরিবহনের সময় যতদূর সম্ভব ধকল যাতে কম হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

❖ খামারে নতুন ভেড়া প্রবেশ করানোর পূর্বে অবশ্যই কিছুদিন (কমপক্ষে ১৫ দিন) সঙ্গনিরোধ শেডে রেখে প্রতিদিন ভালোভাবে পরীক্ষা করতে হবে।

❖ এরোগের প্রাদুর্ভাব হলে সঙ্গে সঙ্গে অসুস্থ ভেড়াকে চিকিৎসার জন্য আলাদা করতে হবে।

❖ খাবারের সময় কিংবা পরিচর্যা করার সময় সুস্থ্য ভেড়াকে অবশ্যই প্রথমে খাওয়াতে হবে। খাওয়ানোর পরে ব্যবহৃত খাবারের পাত্র শক্তিশালী জীবানুনাশক দিয়ে জীবানুমুক্ত করতে হবে।

❖ অসুস্থ ভেড়ার সংস্পর্শে আসা সকল ধরনের দ্রব্যাদি এবং আক্রান্ত ভেড়ার মলমূত্র যথাযথভাবে জীবানুমুক্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে।

❖ আক্রান্ত ভেড়ার শেডের মেঝে নিয়মিত পরিস্কার করে জীবানুনাশক ছিটাতে হবে।

❖ আক্রান্ত ভেড়া মারা গেলে খামার থেকে দূরে একটি গভীর গর্ত (প্রায় ৬ ফুট) করে পুঁতে ফেলতে হবে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

গবেষণায় ঃ

ড. মোঃ এরসাদুজ্জামান, সিনিয়র সাইন্টিফিক অফিসার

ডাঃ মোঃ মইনউদ্দিন খন্দকার, সাইন্টিফিক অফিসার

বি এল আর আই প্রকাশনা নং- ১৯১

প্রকাশকাল ঃ নভেম্বর, ২০০৯

প্রথম সংস্করণ ঃ ৫০০ (পাঁচশত) কপি

প্রকাশনায় ঃ

প্রকল্প পরিচালক

সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প (কম্পোনেন্ট-এ, গবেষণা)

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

সাভার, ঢাকা-১৩৪১, ফোন ঃ ৭৭৯১৬৭০-২, ফ্যাক্স ঃ ৭৭৯১৬৭৫